

দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের  
নির্বাচিত পোস্টে সমগ্র

২০১৭ ইমারী



ফতোয়া আর্কাইভ-২০১৭

দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের

নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৭ ঈসায়ী

## সূচীপত্র

|                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| শাসকদেরকে যারা কাফের মনে করে না তাদের পিছনে নামাযের বিধান!!                                            | ৪  |
| ইসলামী বিধিবিধান প্রত্যাখানকারী শাসকের শরয়ী বিধান সম্পর্কে                                            | ১১ |
| মুফতীয়ে আযম আল্লামা আব্দুস সালাম চাটগামী দা.বা                                                        | ১১ |
| আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে মাক্কী জীবনের সাথে তুলনা করা কী ঠিক হবে?                                    | ১৯ |
| আমার পিতার সাথে কীরূপ আচরণ করবো, যে তাওহীদ এবং শাসকদের কুফরের প্রসঙ্গে আমার কথার কোন গুরুত্বই দেয় না? | ২৩ |
| আমার বিধবা মাকে দেখার মতো আমি ছাড়া আর কেউ নেই। আমার উপর কি জিহাদ ফরয?                                 | ২৫ |
| মুরতাদ বাহিনীর সদস্যদেরকে কি মুরতাদ বলা যাবে? তাদের মধ্যে যারা সরাসরি যুদ্ধে নামে না তাদের বিধান কি?   | ২৭ |
| শাসক বিষয়ক ফতোয়া জানতে চাই????                                                                       | ৩০ |
| কুফরী আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন সূরত এবং তার বিধান                                           | ৩৬ |

## শাসকদেরকে যারা কাফের মনে করে না তাদের পিছনে নামাযের বিধান!!

Ahmad Al-hindi

Member

০৩-২৮-২০১৭

### অনেকের প্রশ্ন:

যেসব আলেম বর্তমান তাগুত শাসকদেরকে কাফের মনে করে না তাদের পিছনে নামায হবে কি'না?

কারণ কাফেরকে যে কাফের মনে করে না সেও কাফের। যেমনটা শাইখুল ইসলাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব নজদী রহ. বলেছেন,

من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر! جماعاً

“যে কাফেরদেরকে কাফের মনে করে না, কিংবা তারা কাফের হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করে, কিংবা তাদের ধর্মকে সঠিক বলে- সে সকলের ঐক্যমতে কাফের হয়ে যায়।”

যেহেতু এসব আলেম শাসকরা কাফের হওয়ার পরও তাদেরকে কাফের মনে করে না, কাজেই উপরোক্ত মূলনীতি অনুযায়ী তারা কাফের হয়ে যাওয়ার কথা। আর কাফেরের পিছনে নামায হয় না।

### উত্তর:

‘কাফেরকে কাফের মনে না করলে কাফের হয়ে যায়’ কথাটা ঢালাওভাবে প্রযোজ্য নয়। এখানে এসব কাফের উদ্দেশ্য যাদের কাফের হওয়ার কথা কুরআন হাদিসে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। যেমন- ইয়াহুদ, নাসারা, মজুস... ইত্যাদি কাফের সম্প্রদায়। হিন্দু, বৌদ্ধ সহ অন্যান্য সুস্পষ্ট কাফের সম্প্রদায়ও এর অন্তর্ভুক্ত। তদ্রূপ যে ব্যক্তি সুস্পষ্টভাবে ইসলাম ত্যাগ করে এসব ধর্মের কোন একটাতে প্রবেশ করেছে সেও এর অন্তর্ভুক্ত। এদেরকে যে কাফের মনে না করবে, কিংবা তারা কাফের হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করবে, কিংবা তাদের ধর্মকে সঠিক বলবে- সে কাফের। কারণ,

কুরআনের অসংখ্য আয়াত এবং অসংখ্য হাদিস দ্বারা তাদের কাফের হওয়াটা সুস্পষ্ট এবং সন্দেহহীনভাবে প্রমাণিত। এরা যে কাফের তা কারো নিকট অস্পষ্ট নয়। এদেরকে কাফের না মানার অর্থ অসংখ্য আয়াত ও হাদিসকে প্রত্যাখ্যান করা, যা সুস্পষ্ট কুফর।

পক্ষান্তরে যাদের কাফের হওয়াটা স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই, বরং তাতে সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ রয়েছে; যারা গভীরভাবে তাহকীক করেছেন তাদের নিকট তাদের কুফরটা ধরা পড়েছে আর যারা গভীরভাবে তাহকীক করতে পারেনি কিংবা যাদের ইলমের স্বল্পতা রয়েছে তাদের নিকট ধরা পড়েনি- এসব কাফের এখানে উদ্দেশ্য নয়। যাদের নিকট এদের কুফরটা স্পষ্ট নয়, তারা এদেরকে কাফের মনে না করলে তারা কাফের হবে না। বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর কুফরটা এই শ্রেণীভুক্ত।

**শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনে নাসের আর-রশীদ বলেন,**

الثالث: أن يكون تكفيره محتملاً للشبهة، كالحكام الحاكمين بغير ما أنزل الله ونحوهم، فهؤلاء وإن كان كفرهم قطعياً عند من حقق المسألة، فإن ورود الشبهة محتمل فلا يكفر من لم يكفرهم، إلا إن أُقيمت عليه الحجة، وكُشفت عنه الشبهة وأزيلت، وعرف أنَّ حكم الله فيهم هو تكفيرهم.

“তৃতীয় প্রকার: তার তাকফীরের মাঝে সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ থাকা। যেমন, আল্লাহ তাআলার নাযিলকৃত বিধান ব্যতীত ভিন্ন বিধান দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনাকারী শাসক ও এ জাতীয় ব্যক্তিরা। মুহাক্কিকদের নিকট এদের কুফরটা অকাট্য হলেও তাতে সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ রয়েছে। কাজেই এদেরকে যারা কাফের মনে করে না তাদেরকে কাফের বলা হবে না; যতক্ষণ না তাদের উপর হুজ্জত কায়ম করা হয়, তাদের সংশয় দূর করা হয় এবং তারা বুঝতে পারে যে, এদেরকে তাকফীর করাই এদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার ফায়সালা।”

(শায়খ আবুল মুনিয়র আশ-শানকিত্বী প্রণীত ‘শরহু কায়িদাতি- মান লাম ইউকাফফিরিল কাফিরা ফাহুয়া কাফির’)

অতএব, যেসব আলেমের তাহকীকের অভাবে কিংবা ইলমের স্বল্পতার কারণে শাসকদের কুফরটা তাদের নিকট স্পষ্ট নয়, তাদেরকে এ কারণে কাফের বলার

যাবে না। অন্যথায় অল্প কিছু মুজাহিদ এবং তাদের সমমনা ব্যক্তি ব্যতীত দুনিয়ার সকল মুসলমানকেই কাফের বলে দিতে হবে। কেননা, তারা ব্যতীত বাকিরা এদেরকে মুরতাদ মনে করে না।

### নামাযের বিধান:

তারা যেহেতু কাফের নয় তাই তাদের পেছনে নামায পড়লে নামায হয় যাবে। বরং যদি সহীহ আকীদার ইমাম না পাওয়া যায় তাহলে এদের পেছনেই নামায আদায় করতে হবে। তবুও জামাআত ছাড়া যাবে না।

এ ব্যাপারে শায়খ আবু মুহাম্মদ আল-মাকদিসী হাফিজাছল্লাহ'র একটি ফতোয়া উল্লেখ করছি।

### শায়খ মাকদিসীর ফতোয়া:

الصلاة خلف من يدعو للحاكم المرتد

\*\*\*

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الشيخ الفاضل :

ما حكم الصلاة - الجمعة وباقي الصلوات - وراء الأئمة الذين يدعون للحاكم المرتد؟ فإن الأقوال قد كثرت علي في هذا الباب، وأين أصلي إن كان هذا حال جميع أو معظم الأئمة والخطباء؟

وجزاكم الله خيرا .

الجواب :

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله .

الأخ الفاضل :

السلام عليكم .

لا ينبغي أن تترك صلاة الجماعة إلا خلف من تحقق عندك وقوعه بمكفر مخرج من الملة، أما ما هو دون ذلك من المعاصي والبدع أو المداهنات؛ فلا يجوز أن يكون مدعاة أو سببا لترك صلاة الجماعة .

ودعاء الخطيب للحاكم المرتد بالهداية أو بالتوفيق لتحكيم الكتاب والسنة أو لما يحبه الله و يرضاه أو لما فيه خير البلاد والعباد ونحو ذلك من الأدعية التي لا تندرج تحت نصره الطاغوت أو نصره قانونه الكفري أو مظاهرتة على الموحدين؛ هذا كله وإن كان من البدع التي لم تكن في القرون المفضلة فقد عد العلماء الدعاء للسلطان المسلم المحكم لشرع الله على منبر الجمعة من البدع المحدثه؛ فكيف بغيرهم من الحكام الكفرة المرتدين؟ !

إلا أن ذلك لا يمنع من صلاة الجماعة خلف أولئك الأئمة الذين يدعون به، ما دام لا يندرج تحت نصره الطاغوت أو نصره شركه - كما قدمنا - فلا ينبغي أن تكون مثل هذه البدع غير المكفرة ذريعة لترك صلاة الجماعة والتهاون بها .

اللهم إلا أن يثبت لديك بالدليل القاطع أن الإمام أو الخطيب من أولياء  
الطاغوت وأنصاره، فهذا لا تحل الصلاة خلفه لأنه ليس من المسلمين - لا  
أبرارهم ولا فجارهم - حتى تسوغ الصلاة خلفه، بمقولة أهل السنة في الصلاة  
خلف البر والفاجر .

...

والسلام .

**“মুর্তাদ শাসকের জন্য যে দোয়া করে তার পেছনে নামাযের বিধান**

\* \* \*

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

শ্রদ্ধেয় শায়খ,

যেসব ইমাম মুর্তাদ শাসকের জন্য দোয়া করে তাদের পেছনে জুমআ’ ও অন্যান্য  
নামায আদায়ের বিধান কি? এ ব্যাপারে অনেক কথা বার্তা হচ্ছে। সব কিংবা  
অধিকাংশ ইমাম ও খতীবের অবস্থা যদি এমনই হয় তাহলে নামায কোথায়  
পড়ব??

জাযাকুমুল্লাহু খাইরান!

\* \* \*

**জওয়াব:**

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা,

আসসালামু আলাইকুম!

যার ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত যে, সে ইসলাম থেকে বের করে দেয় মতো কোন  
কুফরে লিপ্ত হয়েছে, সে ব্যতীত অন্য কারো পেছনে নামাযের জামাআত ছাড়া

উচিত হবে না। কুফরে গড়ায়নি এমনসব গুনাহ, বিদআত বা শিথিলতার কারণে জামাআত ছাড়া জায়েয হবে না।

খতীব যদি মুরতাদ শাসকের হেদায়াতের জন্য কিংবা কিতাব সুন্নাহ মতে বা আল্লাহ তাআলার পছন্দ মতে বা দেশ ও জনগণের কল্যাণকর পন্থায় দেশ চালানোর তাওফীকের জন্য দোয়া করে কিংবা এ জাতীয় অন্য কোন দোয়া করে যা তাগুত বা তাগুতের কুফরী কানূনের নুসরত কিংবা ঈমানদারদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সহায়তার দরজায় পড়ে না, তাহলে এসব বিষয় এইসব দোয়াকারী ইমামদের পেছনে জামাআতের সাথে নামায আদায়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে না। যতক্ষণ না তা তাগুত বা তাদের শিরকের নুসরতের দরজায় না গড়ায়; যেমনটা পূর্বে বলেছি। কাজেই এসব গাইরে মুকাফফির বিদআতকে জামাআত ছেড়ে দেয়া কিংবা তাতে অবহেলা করার ওসীলা বানানো উচিত হবে না।

তবে এসব দোয়া বিদআত যা শ্রেষ্ঠ যামানাগুলোতে – অর্থাৎ সাহাবা ও তাবিঈনদের যামানায় – ছিল না। কেননা, আল্লাহ তাআলার শরীয়ত অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনাকারী মুসলিম শাসকের জন্য জুমআর মিম্বরে দোয়া করাকেও ওলামায়ে কেরাম নব আবিক্কৃত বিদআত আখ্যা দিয়েছেন। তাহলে কাফের ও মুরতাদ শাসকদের জন্য দোয়া করার অবস্থা কি হবে!!

তবে হ্যাঁ, তোমার নিকট অকাটা দলীল দ্বারা যদি সাব্যস্ত হয় যে, ইমাম বা খতীব তাগুতের দোস্ত ও তাদের সহায়ক, তাহলে এর পেছনে নামায হবে না। কেননা, সে মুসলমান নয়। না নেককার মুসলমান, না বদকার মুসলমান যে, তার পেছনে নামায জায়েয হবে এই অজুহাতে যে, আহলে সুন্নাহ নেককার বদকার সবার পেছনেই নামায পড়তে বলে।

ওয়াসসালাম!”

(শায়খ মাকদিসী প্রণীত ‘তুহফাতুল আবরার’, পৃষ্ঠা ১৪৬-১৪৭)

\* \* \*

উল্লেখিত ফতোয়া অনুযায়ী ফরীদ মাসউদদের মত দালালদের পেছনে নামায হবে কি’না তা প্রশ্ন হতে পারে। সাধারণ আলেম ওলামার পেছনে নামায পড়তে কোন

অসুবিধে নেই। বরং সহীহ আকীদার ইমাম না পাওয়া গেলে এদের পেছনেই পড়তে হবে। তবুও জামাআত ছাড়া যাবে না। **والله تعالى أعلم بالصواب**

\*\*\*

বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে। এখানে যতটুকু আলোচিত হয়েছে তাতে মূল বিষয়টা এসে গেছে। সামনে যদি কখনো সুযোগ হয় তাহলে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ!

[বি.দ্র. আমার তাহকীকে মাসআলাটা এমনই ধরা পড়েছে। যদি কারো কাছে এর বিপরিত কোন দলীল বা গ্রহণযোগ্য কারো কোন ফতোয়া থাকে তাহলে জানালে উপকার হবে।]

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৫৮৬০>

# ইসলামী বিধিবিধান প্রত্যাখানকারী শাসকের শরয়ী বিধান সম্পর্কে

মুফতীয়ে আযম আল্লামা আব্দুস সালাম চাটগামী দা.বা  
[hadid\\_bd](#)

Senior Member

০৪-১১-২০১৭

উম্মতের আলেমগণের আবশ্যিক কর্তব্য

হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী দা.বা.

ইসলামের গণ্ডি সংরক্ষণ এবং পাহারা দেওয়া এ উম্মতের শরীয়তপন্থী আলেমদের আবশ্যিক দায়িত্ব। যেমন- ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র নায়কদের দায়িত্ব রাষ্ট্রের ভৌগলিক সীমানা পাহারা দেওয়া। ঠিক এভাবেই এ উম্মতের শরীয়তের প্রাজ্ঞ আলেমদের জন্য জরুরী, তাঁরা ইসলামী আইন-কানুন এবং তাঁর সীমা বর্ণনা করবেন এবং বিধিবিধান প্রয়োগ করার দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানদের কাছে সমর্পণ করবেন। তারপর রাষ্ট্রে সামগ্রিকভাবে ইসলামী বিধিবিধান জারি করে এবং ব্যক্তিগত ইসলামী বিধিবিধানের ব্যাপারে সাধারণ লোকজনকে আমলের উপর অটুট থাকার দিকনির্দেশনা প্রদান করবেন। উদ্দেশ্য হল, ইসলামী বিধিবিধানের সীমানা হিফায়ত করা, আর এটা এ উম্মতের আলেমদের দায়িত্ব। যদি রাষ্ট্রের পরিপূর্ণ সীমান্ত হিফায়ত করা শাসকদের জন্য জরুরী হয়, তবে ইসলামী আইন-কানুন এবং ইসলামী বিধিবিধানের সংরক্ষণ এবং তার দেখাশোনা করা উম্মতের আলেমদের জন্য আরো গুরুত্বপূর্ণ এবং আবশ্যিক কাজ।

সুতরাং যদি কোন দল নিজ দায়িত্বে ত্রুটি করে, টালবাহানার মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করে, তবে তাঁরা আল্লাহর নিকট বড়ই অপরাধী হবে। যেমনভাবে ব্যক্তিগত বিধিবিধান পালনের ক্ষেত্রে অলসতা করা ফিসক এবং বড় ধরনের অপরাধ। আল্লাহর কোন বিধান অস্বীকার করা কুফর, দুনিয়ায় যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। আর পরকালে চিরস্থায়ী জাহান্নাম। এমনিভাবে যেসব বিধান ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত তার

বাস্তব প্রয়োগ না করা সবচেয়ে বড় ফিসক, অর্থাৎ বড় নাফরমানী ও কুফর। এর মধ্যে থেকে কোন শরয়ী বিধান প্রয়োগ এবং বাস্তবায়ন করতে অস্বীকার করা আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ করা এবং ইসলামী বিধিবিধানের বিশ্বাসঘাতকতা করার শামিল। যা অমার্জানীয় অপরাধ। আল্লাহ আমাদেরকে এবং সব মুসলমানকে এসব অপরাধ থেকে মুক্ত রাখুন।

কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াত নিয়ে গবেষণা করুন এবং নিজের দীন ইসলাম এবং ঈমানের ব্যাপারে জরিপ চালান। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

“সুতরাং তোমার প্রতিপালকের শপথ, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাঁদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায় বিচারক বলে মনে করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন প্রকার সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হুষ্টিচিণ্ডে কবুল করে নিবো।”-(সূরা নিসা-৬৫)

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা জ্ঞাত হওয়া গেল যে, কুরআন-হাদীস অনুযায়ী মীমাংসা করা এবং তা হুষ্টিচিণ্ডে মেনে নেওয়া ব্যতীত কোন ঈমানদারের ঈমান সঠিক হয় না। সুতরাং বিচারকদের কুরআন-হাদীস অনুযায়ী মীমাংসা করা ফরয অর্থাৎ জরুরী। আর মীমাংসা গ্রহণকারীদের ঐ মীমাংসা সন্তুষ্টিচিণ্ডে মেনে নেওয়া ফরয তথা আবশ্যিক। অন্যথায় মুমিন হিসেবে বিবেচিত হবে না।

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ইরশাদ করেনঃ

“নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি। যাতে আপনি মানুষের মধ্যে ফায়সালা করেন, যা আল্লাহ আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করান। আপনি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষ থেকে বিতর্ককারী হবেন না।”-(সূরা নিসা-১০৫)

অর্থাৎ- আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবীর উপর যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তা সঠিক এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য। আল্লাহর কিতাবের আলোকে নবী ও তাঁর প্রতিনিধিগণ এবং শাসকবর্গ মীমাংসা করবেন। আর কোন প্রতারক এবং প্রবঞ্চক মুনাফিকের কথার মারপ্যাচে পড়ে তাদের সাহায্যকারী হবেন না।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

“আর আমি আদেশ করছি যে, আপনি তাঁদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদানুযায়ী ফায়সালা করুন, তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না

এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন। যেন তারা আপনাকে এমন কোন নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা আল্লাহ আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। অনন্তর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে নিন, আল্লাহ তাঁদেরকে তাদের গুনাহের শাস্তি দিতেই চেয়েছেন। মানুষের মধ্যে অনেকেই নাফরমান।”-(সূরা মায়েদাহ-৪৯)

অর্থাৎ-সমস্ত মুসলমানের এটাই সরল পথ যে সর্বদা কুরআন-হাদীস অনুযায়ী বিধিবিধান প্রয়োগ করে এবং তদানুযায়ী আমল করে, আর কারোর কোন রকম অভিলাষ কামনা-বাসনার খেয়াল না করা। মুসলমানদের শাসকবর্গ অথবা বিচারকমন্ডলী যারা এরূপ কাজকর্মের পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত, তারা যদি এরকম করেন, তাহলে অমান্যকারীরা তাদের সঠিক রাস্তা থেকে দূরে সরিয়ে দেবে এবং পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যাবে।

সুতরাং মুসলিম শাসকবর্গ এবং তত্ত্বাবধায়কদের সবসময় এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা জরুরী যে, তারা কিতাব ও সুন্নাহ অনুসারে বিচার কার্য মীমাংসা করবেন এবং ইসলামের বিধিবিধান বাস্তবায়ন করবেন। যদি প্রজাসাধারণ বা অধীনস্তরা তাদের আদেশ না মানে, তবে আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন। এজন্য মুসলিম শাসকবর্গ আল্লাহ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হবেন না এবং কিয়ামতে দিবসে তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে না। কিন্তু মুসলমান শাসকবর্গ ও বিচারকমন্ডলী যদি কুরআন-সুন্নাহ অনুসারে বিচার কার্য মীমাংসা না করেন, তবে তাদের কঠিন শাস্তি হবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেনঃ

“এবং যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদানুযায়ী ফায়সালা করে না, তাড়াই কাফির।”-(সূরা মায়েদাহ-৪৪)

অর্থাৎ- যেসব ব্যক্তি কুরআন-সুন্নাহ অনুসারে বিধিবিধান জারি করে না অথবা এটাকে আমলযোগ্য বলে বিবেচনা করে না বা এটাকে অসম্পূর্ণ গণ্য করে, তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তুলে, যে কারণেই হোক ইচ্ছাধীন থাকা অবস্থায় শরয়ী বিধান জারি করে না, এসব লোক কাফির। যদিও তারা মুসলিম নাম ধারণ করে। তাদের বিধান কাফিরের মত। কাফিরদের সাথে যেমন আচার-ব্যবহার করা হয়, তদ্রূপই তাদের সাথে আচরণ করা হবে।

আল্লাহ বলেন,

“এবং যে সব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদানুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই জালিম”-(সূরা মায়দাহ-৪৫)

কতল ও কিসাস(হত্যার পরিবর্তে হত্যা) এর বর্ণনা পরম্পরায় আল্লাহ তাআলা আহলে কিতাবদের উপর তিরস্কার করতে গিয়ে বলেন- তাদের কাছে কিতাবুল্লাহ অর্থাৎ তাওরাতের মধ্যে কিসাস ও দিয়্যাত(রক্তক্ষন) এর বিধিবিধান বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বাহানা হিসেবে আপনার কাছে আসে এবং তাদের তাওরাতের বিধি অনুসারে মীমাংসা করে না, সে কিতাব অনুসারে বিচার করে না, তাঁরা বড় জালিম।

আল্লাহ বলেনঃ

“এবং যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদানুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই পাপাচারী।”-(সূরা মায়দাহ-৪৭)

উক্ত আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, নাসারা, ইহুদী বা মুসলমান যেই হোক, যখন দ্বীনি বিধান গোপন করে অথবা উক্ত বিধান বর্ণনা না করে অথবা এর উপর আমল না করে অথবা এটাকে আমলের যোগ্য বলে বিবেচনা না করে, তখন সে ব্যক্তি ফাসিক, জালিম এবং কাফির হয়ে যায়। তার পরিণতি কি হবে? আল্লাহ বলেন,

“তারপর আমি অবতীর্ণ করেছি জালিমদের উপর আযাব আসমান থেকে নির্দেশ লঙ্ঘন করার কারণে।”-(সূরা বাকারাহ-৫৯)

“আর কতই না উত্তম হত যদি এ জালিমরা পার্থিব কোন আযাব প্রত্যক্ষ করেই উপলব্ধি করে নিত যে, যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহর আযাবই সবচেয়ে কঠিনতম।”-(সূরা বাকারাহ-১৬৫)

“অতঃপর যখন তাঁরা সেসব বিষয় ভুলে গেল, যা তাঁদেরকে বোঝানো হয়েছিল, তখন আমি সেসব লোককে মুক্তি দান করলাম যারা মন্দ কাজ থেকে বারণ করত। আর পাকড়াও করলাম গুনাহগারদেরকে নিকৃষ্ট আযাবের মাধ্যমে তাদের নাফরমানীর দরুণ। তারপর যখন তাঁরা এগিয়ে যেতে লাগল সে কর্মে যা থেকে তাদের বারণ করা হয়েছিল, তখন আমি নির্দেশ দিলাম যে, তোমরা লাঞ্চিত বানর হয়ে যাও।”-(সূরা আ'রাফ-১৬৫, ১৬৬)

উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহ দ্বারা ইশারার জন্য যথেষ্ট যে, আল্লাহ তাআলার আহকাম তথা বিধিবিধানের নাফমানীকারীদের জন্য রয়েছে দুনিয়ায় আযাবের ধমকি। আর আখেরাতে রয়েছে এর থেকে বেশি অপমান ও অসম্মানজনক আযাব। এ জন্য সমগ্র মুসলিম দুনিয়ার মুসলমানের উচিত, নতুন করে তাওবা করে এবং ভবিষ্যতের নাফরমানী এবং ফিসক-ফুজুর থেকে তাওবাকারী হয়ে যাওয়া। আর সমগ্র শরয়ী বিধানের উপর আমল করা এবং তাঁর উপর দৃঢ়পদ থাকা। অন্যথায় কষ্টদায়ক আযাবের জন্য প্রস্তুত থাকা ছাড়া উপায় নেই।

### দু'টি বিষয়ের উপর দ্বীন-ইসলামের ভিত্তি:

দ্বীন ইসলাম ঐ জিনিসের নাম যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে উম্মতে মুহাম্মদীকে প্রদান করা হয়েছে। আর এর ভিত্তি দু'টি বিষয়ের উপর। তার মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে কিতাব অর্থাৎ পরিত্র কুরআন। দ্বিতীয়টি সুন্নাতে রাসুল। তারপর ইজমায়ে উম্মত অর্থাৎ উম্মতের ঐক্যমত এবং কিয়াস। এ দু'টো মূলনীতি প্রথম দু'টো মূলনীতির অধীন। সুতরাং প্রথম দু'প্রধান উৎস থেকে যে বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়, চাই সেটা আকাইদ(বিশ্বাসমূলক) ও চিন্তা গবেষণামূলক হোক বা ইবাদাত ও লেনদেন সম্পর্কীয় হোক, জীবিকা সম্পর্কীয় হোক, জীবন যাপন প্রণালী সম্পর্কীয় হোক, চারিত্রিক হোক, শিষ্টাচার সম্পর্কীয় হোক, রাজনৈতিক হোক, রাষ্ট্রপরিচালনা বিষয়ক হোক, ইসলামী দণ্ডবিধান বা অন্যায় অপরাধের অন্য কোন শাস্তি সম্পর্কীয় হোক সব বিধিবিধানের সমষ্টির নাম দ্বীন ইসলাম।

এগুলোর উপর দৃঢ় বিশ্বাস ও ঈমান গ্রহণের পর তার উপর সম্ভৃতি, আকর্ষণ এবং আমল দ্বারা সজ্জিত হওয়ার মাধ্যমে মানুষ মুসলমান হিসেবে গণ্য হওয়ার উপযুক্ততা লাভ করে অন্যথায় নয়। যে সব রাষ্ট্র উক্ত বিষয়গুলো জারি সেটিকেই ইসলামী হুকুমত বলে অন্যথায় নয়। অতএব, সব ইসলামী বিশ্বের মুসলমানদের উচিত আল্লাহর বিধানের উপর আমল করতঃ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী আইন-কানুন শীঘ্র বাস্তবায়ন করা। কেননা, মুসলমানদের উন্নতি ও কল্যাণ উক্ত বিষয়গুলোর উপর নির্ভর করে, আর তাদের পথদ্রষ্টতা ইসলামী বিধান ত্যাগ করা এবং শাসকদের বেপরোয়া ভূমিকার কারণে হয়ে থাকে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

“আমি তোমাদের মাঝে দু’টি জিনিস রেখে যাচ্ছি, পথভ্রষ্ট হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত এ দ’টো জিনিস আঁকড়ে থাকবে। সেগুলো হল, আল্লাহর কিতাব এবং আমার সুনাত।”

দ্বীন ইসলামের নিয়মনীতি সব দৃষ্টিকোণ থেকেই পূর্ণাঙ্গ। এর চেয়ে অধিক পূর্ণাঙ্গ কোন বিধান আল্লাহ তাআলা এ পৃথিবীতে অবতীর্ণ করেন নি। এরূপ কোন বিধিবিধান কল্পনাও করা যায় না। এ বিধানে রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে শুরু করে ঘরোয়া স্তর পর্যন্ত, ব্যক্তি জীবন, সমাজ জীবন, রাজনৈতিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন তথা সব কিছুর জন্য ব্যাপক মূলনীতি এবং শাখা-প্রশাখা বিদ্যমান। আর এর মধ্যে প্রকাশ্য ও গোপনীয় বিষয়ের সংশোধনের সব মূলনীতি ও শাখাগত বিষয়ের বিধান পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান। দ্বীন ইসলামের পরিপূর্ণ ভান্ডার সেসব মূল্যবান মণিমুক্তা দ্বারা পরিপূর্ণ, যা মানুষের উন্নতি ও শ্রেষ্ঠত্বের জন্য প্রয়োজন। যখন সব প্রচলিত আইন-কানূনের আঁচল সেসব মণিমুক্তা থেকে মুক্ত।

দ্বীন ইসলামের সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষতর আদর্শের যেমন লেনিন, কার্লমার্কস, হেগেল এবং এঙ্গেলস প্রমুখ ব্যক্তিদের বাতিল নীতিমালা গ্রহণের কোন প্রয়োজন নেই। তেমনি বৃটেন, ফ্রান্স এবং আমেরিকা ইত্যাদি পশ্চিমাদেশের পথভ্রষ্টকারী এবং ধ্বংসাত্মক আদর্শ শিক্ষা মাগার জন্য তাদের দ্বারে ধরণা দেওয়ার কোনই প্রয়োজন নেই। কেননা, দ্বীন ইসলাম হচ্ছে সমগ্র দুনিয়ার এবং মানুষের প্রতিপালকের বিধান, যিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী, সর্বজ্ঞ, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। এমন প্রভুর নিকট থেকে যে বিধান পালনের জন্য দেওয়া হবে তাঁর মধ্যে কোন প্রকারের অসম্পূর্ণতা, ত্রুটি এবং সন্দেহের অবকাশ নেই।

এ জন্য যে, যিনি সমগ্র সৃষ্টিজগতের সৃষ্টিকর্তা তিনি ইনসানিয়্যাত তথা মনুষ্য জাতিরও সৃষ্টিকর্তা, তিনি মানুষের জীবনের শুরু থেকে পরকাল পর্যন্ত যাবতীয় জীবনোপকরণের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত। আর তাঁর বিধান গোটা মানব গোষ্ঠীর জন্য সমানভাবে উপকারী।

**ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এবং উদ্দেশ্যঃ**

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সর্বদা তাঁর রাসূলগণকে প্রেরণের মাধ্যমে এই পূর্ণাঙ্গতম বিধানকে বাস্তবায়ন করে মানুষের উন্নতি-কল্যাণের ব্যবস্থা করতে থাকেন। আর শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বশেষ কিতাব পবিত্র কুরআন প্রদান করে ভূপৃষ্ঠের অধিকাংশ স্থানে তাঁরই বিধান বাস্তবায়ন করেন এবং এ কুরআন ও সুন্নাহের বিধান পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে দীর্ঘকাল পর্যন্ত জারি ছিল, অধিকাংশ জায়গায় দ্বীন ইসলামের বিজয় এবং শ্রেষ্ঠত্বের আলোচনা বিদ্যমান ছিল। অপরদিকে কাফির এবং সীমালঙ্ঘনকারীদের আদর্শিক পতাকা ছিল অবনত। আল্লাহ তাঁর শেষ নবীকে যে উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন তা পরিপূর্ণ হয়েছে। কিন্তু দূর্ভাগ্য যে, আমাদের খারাপ আমলের কারণে ইসলামী রাষ্ট্র এবং ইসলামী বিধিবিধান ধ্বংস হয়ে গেছে। যার শাস্তি আমরা এবং সমগ্র মুসলিম উম্মাহ ভোগ করছে। সুতরাং এখনো আমাদের সচেতন হওয়া উচিত। সমগ্র মুসলিম রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা উচিত। শরয়ী আইন-কানুন জারি করে দেওয়া উচিত। কেননা, ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচয় হল, সে রাষ্ট্রে ইসলামী আইন-কানুন তথা কুরআন-হাদীসের বিধান প্রতিষ্ঠিত থাকবে। রাষ্ট্রের শাসকবর্গ থেকে শুরু করে প্রজাবর্গ পর্যন্ত সবাই উক্ত আইনের পাবন্দী হবে। তারপর এ রাষ্ট্র ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য হওয়ার উপযুক্ত এবং ওখানকার শাসকবর্গ মুসলমানদের শাসনকর্তা এবং ওখানকার প্রজা মুসলিম প্রজা হিসেবে গণ্য হওয়ার উপযুক্ত হবে।

যদি মুসলিম শাসকদের তরফ থেকে মুসলিম দেশে ইসলামী আইন জারি না করা হয়, বরং কুফর ও খোদাদ্রোহী আইন প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং একে আরো উন্নতি প্রদান করা হয়। তখন ঐ দেশসমূহ ইসলামী দেশ হিসেবে কখনো গণ্য হওয়ার উপযুক্ত নয় বরং সেগুলোকে অমুসলিম দেশ হিসেবে সাব্যস্ত করা হবে। কেননা, ইসলামী দেশের পরিচয় ইসলামী আইন প্রয়োগের দ্বারা হয়। উদাহরণ স্বরূপ, কাফিরদের দেশসমূহ দেখা যেতে পারে- যে দেশে সাম্যবাদ প্রচলিত সে দেশকে কমিউনিস্ট দেশ বলা হয়। কেননা, কমিউনিজম হল রাষ্ট্র পরিচালনার ভিত্তি। গণতান্ত্রিক দেশে গণতান্ত্রিক নিয়ম প্রচলিত থাকে। এ কারণে সেটিকে গণতান্ত্রিক দেশ বলা হয়। যেখানে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বিদ্যমান সেটিকে ধর্ম-নিরপেক্ষ দেশ বলা হয়। সুতরাং কোন ইসলামী দেশের শাসকবর্গ যদি ইসলামী আইন-কানুন প্রতিষ্ঠা না করেন তবে সে দেশকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করার উপযুক্ততা থাকে না। এভাবে কোন ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসীরা না ইসলামী আইন চায়, না

সে আইনের প্রতি সম্মত, বরং অনৈসলামিক আইনের বাস্তবায়ন চায় এবং সে আইনের প্রতি খুশী, তাহলে এদের মুসলমান বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্যতা নেই। বরং এমন লোক কাফির উপাধী পাওয়ার উপযুক্ত।

পূর্বে যেসব কুরআনের আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোর উপর চিন্তা গবেষণা করা প্রয়োজন। এটা বুঝা দরকার যে, কোন ইসলামের দাবীদার কালেমায়ে তায়্যিবাহ পড়ে, নামায পড়ে, রোযা রাখে, কিন্তু ইসলামের অন্যান্য বিধানের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে না, ইসলামী ইনসাফ এবং ইসলামী রাষ্ট্র অস্বীকার করে, এর দলবিধানের উপর বিশ্বাস রাখে না, কিসাস ও দিয়াত অস্বীকার করে, ইসলামের উত্তরাধিকার আইন স্বীকার করে না, ইসলামী বিচার ব্যবস্থা ও সাম্য গ্রহণ নীতিকে মানে না, এমন ইসলামের দাবীদার কুরআন-হাদীস অনুসারে মুসলমান নয়। বরং এমন ব্যক্তি পাফা কাফির ও মুনাফিক। কেননা, ধীন ইসলামে সেই ব্যক্তি মুসলমান, যে ইসলামের সব জরুরী এবং অকাট্য বিধানকে মানে এবং স্বীকার করে, আর তাঁর উপর কোন অভিযোগ না করে। আল্লাহর নিকট আমলের ত্রুটি ক্ষমাযোগ্য। কিন্তু আকীদা ও বিশ্বাস সংক্রান্ত ইসলামের বিধান অস্বীকার করা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।

‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ’ এই কালেমায়ে তাওহীদ ইসলামের সব বিধানকে বেস্টন করে আছে। এ কালেমায়ে দু’টো অংশ পরিদৃশ্যমান। কিন্তু শিরোনামে এর সব বিধান এসে যায়। পূর্বে এর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ন্যায় বিচারকদের জন্য এ সামান্য ইশারাই যথেষ্ট। আল্লাহ তাআলা আমাকে, শাসক শ্রেণীকে এবং ইসলামী বিশ্বের সব মুসলমানকে সঠিক বুঝার তাওফীক দান করুন। ইসলামী আইন তথা কুরআন-সুন্নাহর কানুন জারি করার এবং তাঁর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। সর্বপ্রকার আযাব ও শাস্তি থেকে বাঁচার তাওফীক দান করুন। আমীন।।

[উৎসঃ উম্মুল মাদারিস হাটহাজারী মাদরাসার মুখপাত্র মাসিক মুঈনুল ইসলাম, এপ্রিল-২০১৭ সংখ্যা]

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৬১৪০>

## আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে মাক্কী জীবনের সাথে তুলনা করা কী ঠিক হবে?

[abu\\_mujahid](#)

Senior Member

০৫-০৩-২০১৭

লেখকঃ শায়খ সুলায়মান আল-উলওয়ান (আল্লাহু তাঁকে সৌদির কারাগার থেকে দ্রুত মুক্তি দান করুন)

মাক্কী জীবনে সাহাবীরা দুর্বল অবস্থায় ছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিভিন্ন কারণে মক্কার উদ্ভূত পরিস্থিতিগুলোকে মদীনার সময়ের থেকে ভিন্ন ভাবে মোকাবেলা করেছিলেন।

প্রথম কারণ হচ্ছে মুসলমানরা দুর্বল অবস্থায় ছিলেন।

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে শরী'আহ পরিপূর্ণ ছিলো না।

তৃতীয় কারণ হচ্ছে রাসূলুল্লাহর (ﷺ) রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিলো না।

চতুর্থ কারণ হচ্ছে ইসলাম তখনও দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েনি।

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, মক্কার বাস্তবতা মদীনা থেকে ভিন্নতর ছিলো। তাই যখন কোনো ব্যক্তি দুর্বল অবস্থায় থাকবে, তখন শারী'আহ অনুযায়ী পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে।

তাই বলে ইসলামী মূলনীতিগুলোর ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া যাবে না। সেই সাথে দীনের ব্যাপারে কোনোরকম আপস করা যাবে না।

আবার দুর্বল অবস্থায় প্রভাবশালী এবং ক্ষমতাসীন ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করা যাবে না। এই ধরনের পরিস্থিতিতে শারী'আহর চাহিদা অনুযায়ী উম্মাহর স্বার্থ সংরক্ষণ করতে হবে এবং নৈতিক অধঃপতন থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে একজন মুসলিমকে কিছু হিকমাহ [প্রজ্ঞা] প্রয়োগ করতে হবে। অপরপক্ষে এর বিপরীত অবস্থায় অর্থাৎ ক্ষমতাসীন অবস্থায় কুওয়াত [শক্তি] এবং আল-হায়ম [গাভীর্ষ] দ্বারা পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে। এবং অবশ্যই হক্ক [সত্য] কথা বলতে হবে।

তবে আমাদের পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণরূপে শুধু মাক্কী জীবনের সাথে মিলিয়ে ফেলাকে শারী'আহ অনুমোদন করে না।

আমরা রাসূলুল্লাহর (صلی الله علیه و سلم) শারী'আহ পরিপূর্ণরূপে পেয়েছি। আল্লাহ্\* তাঁর রাসূলকে বলেন,

“আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দীনকে পূর্নাক্ষ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দীন হিসেবে পছন্দ করলাম” [সূরা মায়দাঃ ৩]

অপেক্ষাকৃত দুর্বল পরিস্থিতিতে অনেক সময় মানুষ অপমান কিংবা দ্বীনের ব্যাপারে পরীক্ষিত হওয়ার ভয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার সামর্থ রাখে না।

কিন্তু ব্যাপারটি এমন নয় যে এই অক্ষমতার কারণে ইসলামের বিধান পরিবর্তিত হয়ে যায়। যদি মানুষ সামর্থ অর্জন করে এবং শক্তি ও ক্ষমতালাভ করে পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত হয়ে যায় তাহলে এটি প্রশংসাযোগ্য।

কারণ এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহর (صلی الله علیه و سلم) পক্ষ থেকে প্রমাণদি বিদ্যমান।

মাক্কী যুগ সম্পূর্ণ ভাবে আমাদের বর্তমান সময়ের সাথে তুলনা করাটা কিছু আধুনিক আলেম, ত্বলিব ও দা'ঈদের ভুল। এটি (ইসলামি) ইলমবিহীন বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাভিত্তিক দাওয়াতের ফলে সৃষ্ট একটি ধারা।

এদের দা'ওয়াহ করার মূলে সাধারণত থাকে বিজ্ঞান ভিত্তিক, বুদ্ধিবৃত্তিক কিংবা তাত্ত্বিক, কিংবা কোন ইসলামি আন্দোলন ভিত্তিক ধ্যানধারণা।

এরা নিজেদের পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে চায় এবং নিজেদের সুবিধার্থে মাক্কী যুগকে নিজেদের অবস্থার সাথে মেলায়। কিন্তু এটি ভুল!

কারণ আমরা মক্কার বাস্তবতা আমাদের বাস্তবতার সাথে তুলনা করতে পারি না। তাহলে আমরা নিজেদেরকে ইসলামী শারী'আহর অনেক মূলনীতি থেকে নিজেদের বিচ্যুত করে ফেলবো।

মক্কা শারী'আহ পূর্ণাঙ্গ ছিলো না। কিন্তু আমাদের কাছে শারী'আহ পরিপূর্ণ অবস্থায় আছে।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, মক্কার এহেন [কটিন] পরিস্থিতি সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হক [সত্য] গোপন করেননি।

হয়তো কিছু কারণে সবক্ষেত্রে মক্কা কাকফেরদের সার্বিকভাবে মোকাবিলা করেননি কিন্তু কক্ষগো সত্য গোপন করেননি।

কিন্তু এখন অনেকেই হক কথা না বলে মাক্কী জীবনের দোহাই দিয়ে গোপনে সংস্কার কাজ বা এমন কিছু করার চেষ্টা করছে। এরা আসলে হক গোপন করছে। এটা ঠিক নয় এবং এর কোনো ভিত্তি (ইসলামিক শারী'আহতে) নেই।

“বলুনঃ সত্য তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত। অতএব, যার ইচ্ছা, বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যার ইচ্ছা অমান্য করুক” [সূরা কাহাফঃ ২৯]

তথ্যসূত্র-<http://nobodhara.net/২০১৭/০৩/১০/meccanperiodqa/>

# কমেন্ট

## আবু মুহাম্মাদ

Senior Member

০৫-০৩-২০১৭

জাযাকুমুল্লাহু খাইরান। মূল বিষয়টি হচ্ছে, মাক্কী জিবনে জিহাদ আল্লাহর পক্ষ থেকেই নিষেধ ছিল। তাই তারা করে নি। অন্য যতই কারণ দেখানো হোক তা একটা ঘটনার সামনে স্তম্ভিত হয়ে যায়। একবার খবর ছড়াল কুফফাররা আল্লাহর নবীকে অত্যাচার করেছে, তখন যুবক এক সাহাবী খুলা তরবারী নিয়ে বের হয়ে গেলেন। পথে আল্লাহর নবীকে দেখে আশ্বস্ত হলেন। তখন নবী সাঃ জিজ্ঞেস করলেন, যদি আমি সমস্যায় পরতাম তাহলে কি করতে ? তিনি বললেনঃ মৃত্যু পর্যন্ত লড়াই করতাম। তার মানে তখন তারা জিহাদের যন্যে পাগল ছিল, কিন্তু আল্লাহ তায়ালার নিষেধের কারণে করেন নি। এখন যেহেতু ফরজ তাই করতেই হবে।

আর কারনটা এই ভাবে উল্লেখ করার ফায়দা হচ্ছে, আমার কাছে হয়ত এখন মুসলিমরা দুর্বল নয়। অন্য কেহ হয়ত ভুল যুক্তিতে দুর্বল বলে বসে থাকবে। যেটা এখন হচ্ছে।

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৬৫৮৬>

আমার পিতার সাথে কীরূপ আচরণ করবো, যে তাওহীদ  
এবং শাসকদের কুফরের প্রসঙ্গে আমার কথার কোন গুরুত্বই

দেয় না?

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৫-০৯-২০১৭

**প্রশ্ন:**

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ! আমার পিতা নামায রোযা করে। যাকাত দেয়। আর মনে করে এতটুকুই ইসলাম। আমি যদি তাওহীদের আলোচনা করি তো আমার কথার দিকে ভ্রক্ষেপই করে না। মনে করে এগুলো কিছু কিছু সংগঠনের বিচ্ছিন্ন চিন্তাধারা। আমি তার সাথে কথা জুড়লেই তিনি বলেন, এ দেশ আফগান নয় যে, এখানে ঘোষণা দিয়ে ইসলাম পালন করা যাবে। শরীয়তের হুদুদ বাস্তবায়ন করা যাবে। অনেক সময় জোর আওয়াজে চিল্লাচিল্লিও শুরু করে দেন। রাগান্বিত হয়ে যান। বিশেষত যখন শাসকদের কুফরের বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে যাই। এখন আমি কি করবো? আমার এমন আর্থিক সামর্থ্যও নেই যে, পিতা মাতাকে ছেড়ে আলাদা বাসা নিয়ে থাকতে পারি। এ অবস্থা চলতে থাকলে আমি কি করবো? আমি দিশেহারা হয়ে আছি। অনুগ্রহ করে আমাকে সমাধান দিন।

**উত্তর:**

ওয়া আলাইকুমুস সালামু ওয়া রাহমাতুল্লাহ! শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা! আমাদের দেশের সাধারণ লোকদের অবস্থা এমনই। শাসকদের আনুগত্য করতে করতেই তাদের আজীবন কেটেছে। বেতন ভাতার ভয়ে কিংবা শাসকদের জুলুম অত্যাচারের ভয়ে তারা তাদের আনুগত্য করে চলে। তবে আল্লাহ তাআলা নব প্রজন্মের মাঝে জাগরণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তাওহীদের দাওয়াত এবং জিহাদকে তাদের নিকট প্রিয় করে দিয়েছেন। তুমি আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় কর যে, তিনি তোমাকে তাদেরই একজন বানিয়েছেন। আর তুমি তোমার পূর্বের অবস্থা স্মরণ

কর। তোমার পিতার সাথে সদাচারণ কর। নরমভাবে স্নেহ ভালবাসার সাথে তাকে দাওয়াত দিতে থাক। আর স্মরণ কর আল্লাহ তাআলার এ বাণীর কথা, ( كَذَلِكَ ) (ইতিপূর্বে তোমরাও এমনই ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন। ) আর তুমি তোমার পরিবার ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যেও না। বরং অবিরাম তোমার পিতাকে দাওয়াত দিতে থাক। হকের কথা শুনাতে থাক। হেকমতের সাথে। সুন্দর নসীহতের সাথে। তোমার পিতা চিল্লাচিল্লি শুরু করলেও তুমি চিল্লাচিল্লি করো না। তোমার পিতার আওয়াজের চেয়ে জের আওয়াজে কথা বলো না। তার জন্য দোয়া করতে থাক ইখলাছের সাথে, যেন আল্লাহ তাআলা তাকে সঠিক পথ দেখান। আল্লাহ তাআলা তোমাকে তাওফীক দান করুন। তোমার দ্বারা তোমার পিতাকে সঠিক পথের সন্ধান দিন।

**উত্তর প্রদানে:** আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদিসী হাফিযাছল্লাহ!

মিস্বারুত তাওহীদি ওয়াল জিহাদ।

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৬৬৭৬>

# আমার বিধবা মাকে দেখার মতো আমি ছাড়া আর কেউ নেই। আমার উপর কি জিহাদ ফরয?

## ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৫-০৯-২০১৭

### প্রশ্ন:

আমি একজন মুসলিম যুবক। আমি জিহাদ করতে চাই। আমার পিতা ইন্তেকাল করেছেন। আমার মাকে দেখার মত আমি ছাড়া আর কেউ নেই। আমার উপর কি জিহাদ ফরয? নাকি এই ওজরের কারণে আমার উপর থেকে জিহাদের ফরজিয়াত রহিত হয়ে যাবে?

### নিবেদক

আবু আসেম আল-মিসরী

### উত্তর:

বর্তমান যামানায় জিহাদ ফরযে আইন। তোমার মাকে দেখার মতো কেউ নেই বলে তোমার থেকে জিহাদের ফরজিয়াত রহিত হয়ে যাবে না। তবে তুমি যে দেশে বসবাস করছো সেখানকার পরিস্থিতি অনুযায়ী হুকুমের মাঝে কিছুটা তারতম্য হবে। যদি শত্রুদের সাথে যুদ্ধ বেঁধে গিয়ে থাকে এবং তোমাদের মত যুবকদের তাতে শরীক হওয়া আবশ্যিক হয়ে পড়ে তবে তোমার মাকে দেখার মত কেউ না থাকলেও তোমার জন্য জিহাদে বের হয়ে যাওয়া ফরয। কেননা, দ্বীনের মাসলাহাত সকল মাসলাহাতের চেয়ে অগ্রগণ্য।

আর যদি অবস্থা এমন না হয়, তাহলে আশাকরি তোমার জন্য জিহাদে না বের হয়ে তোমার মায়ের দেখাশুনা করা বৈধ হবে, যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলা কোন ব্যবস্থা করে দেন। তবে তোমাকে জিহাদের নিয়ত রাখতে হবে। তার জন্য ই'দাদ-প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকতে হবে। সবরের সাথে তাওহীদের দাওয়াত দিতে থাকতে হবে।

সম্ভাব্য সকল পন্থায় মুজাহিদদেরকে সহায়তা করে যেতে থাকতে হবে। আল্লাহ তাআলা তোমাকে তাওফীক দান করুন!

**উত্তর প্রদানে:**

**আবু উসামা আশ-শামী, শরয়ী বিভাগ, মিস্রার তাওহীদি ওয়াল জিহাদ।**

=====

প্রিয় ভাইয়েরা, আমাদের দেশে এখনো সরাসরি যুদ্ধ শুরু হয়নি। কাজেই পরিবার পরিজনের দেখাশুনার পাশাপাশি জিহাদের কাজে শরীক হওয়া আমাদের দেশে তেমন কোন কঠিন কাজ নয়। বিভিন্নভাবে সামর্থ্য অনুযায়ী মুজাহিদদেরকে সহায়তা করা তেমন কোন কঠিন কাজ নয়। একটু ইচ্ছা থাকলেই ফরয জিহাদের দায়িত্ব আদায় করে গাজওয়াতুল হিন্দের সওয়াবের ভাগ পাওয়া যায়। আর যারা সম্পূর্ণ জিহাদের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন তাদের তো সৌভাগ্যের কোন সীমাই নেই। আল্লাহ তাআলা আমাদের দেশের জনগণকে বুঝার এবং গাজওয়াতুল হিন্দে শরীক হওয়ার তাওফীক দান করুন। আপনারা যদি একটু হিম্মত করে জনগণকে বুঝান তাহলে আশাকরি অতিশীঘ্রই জনগণ বুঝে যাবে। দূরে না পারলেও অন্তত নিজের আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধু বান্ধবকে যথাসম্ভব নিরাপত্তা বজায় রেখে বুঝাতে পারি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওফীক দান করুন!

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৬৬৮৯>

# মুরতাদ বাহিনীর সদস্যদেরকে কি মুরতাদ বলা যাবে? তাদের মধ্যে যারা সরাসরি যুদ্ধে নামে না তাদের বিধান কি?

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৫-২২-২০১৭

**প্রশ্ন-১:** পাকিস্তানী, আফগানী, ইরাকী এবং এ জাতীয় অন্যান্য বাহিনীর সদস্যদেরকে কি মুরতাদ বলা যাবে, যখন তাদের মধ্যে কিছু লোক এমনও রয়েছে যারা মুরতাদ নয়? যদি বলা জায়েয হয় তাহলে এর দলীল কি?

**প্রশ্ন-২:** পাকিস্তানী বাহিনীর যে অফিসার কিংবা সৈনিক সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হয় না, এমনকি বাহিনীকে যুদ্ধে সহায়তা করা থেকেও বিরত থাকে তার কি বিধান? শুধু বাহিনীকে চাকরিরত কিংবা সম্পৃক্ত থাকাটাই কি রিদ্দাহ বলে গণ্য হবে?

=====

**উত্তর:** যেসব বাহিনীর কথা আপনি উল্লেখ করেছেন সেগুলো মুরতাদ তাগুত হুকুমতের অধিনস্থ। মূলত এদের বিধান কুফর ও রিদ্দাহই। কেননা, এরাই তাগুতদেরকে সহায়তা করে, সমর্থন দেয়। তাদের শাসনের ভিত্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। মানব রচিত আইন কানুন এবং কুফরী সংবিধানকে বুলেট বোমার জোরে বাস্তবায়িত করে। মুজাহিদ, দাঈ এবং তাওহীদপন্থীদেরকে কতল করে। এছাড়াও আরো বিভিন্ন সুস্পষ্ট কুফরীতে তারা লিপ্ত হয়। অতএব, যে কেউ এসব বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হবে সেই কাফের, মুরতাদ; তার কাজ তাতে যাই হোক না কেন। তাকে মুরতাদ বলা যাবে।

এদেরকে মুরতাদ বলা জায়েয হওয়ার দলীল আল্লাহ তাআলার বাণী- { فَلْيَا أَلْمُ } (আপনি বলুন, হে কাফেররা!) (কাফিরন-১)।

আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা কাফেরদেরকে যে নাম দিয়েছেন সে নামেই তাদেরকে সম্বোধন করার জন্য তিনি তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ দিয়েছেন। আর মুর্তাদ তো হচ্ছে যে মুসলমান হওয়ার পর কাফের হয়ে যায়। কাজেই এ সম্বোধনে সেও অন্তর্ভুক্ত হবে। অতএব, এসব বাহিনীর প্রত্যেক সদস্যের উপর এই বিধান বর্তাবে। তাগুত বাহিনীর সৈনিকের মূল যে বিধান যুদ্ধ না করার কারণে কেউ তার আওতাভির্ভূত হবে না। কেননা, উলামায়ে কেরামের সিদ্ধান্ত- মুহারিবি [যোদ্ধা] দলগুলোতে সরাসরি অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তি আর তাতে সহযোগীতাকারীর বিধান একই।

আর যা বলা হয় যে, এসব বাহিনীর মধ্যে এমন কিছু ব্যক্তিও রয়েছে যারা হুকুমতকে সহায়তা করে না, তার সাথে বন্ধুত্ব করে না, মানব রচিত কানুনের সহায়তা করে না... ইত্যাদি ইত্যাদি যা বলা হয় তা মূলত খেয়াল-কল্পনাপ্রসূত কথা এবং বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে। এর কোনও প্রমাণ নেই। বাস্তবতা বরং এর বিপরীত। আর যদি ধরে নেয়াও হয় যে, এমন কিছু লোক রয়েছে, তবুও এটুকু তো অবশ্যই বলতে হবে যে, তাগুতরা যে নাফরমানী করছে এসব লোক ইচ্ছাকৃতভাবে সেক্ষেত্রে তাগুতদের দল ভারী করছে। আর যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের দল ভারী করে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। ইমাম নববী রহ. বলেন, “যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের দল ভারী করে, বাহ্যিক দুনিয়াবী শাস্তির বেলায় তার উপর তাদেরই বিধান প্রযোজ্য হবে।”

তাছাড়া যদি ধরেও নেয়া হয় যে, এসব বাহিনীর মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা যুদ্ধে অংশও নেয় না এবং বাহিনীকে যুদ্ধে কোনরূপ সহায়তাও করে না, আর তাদের মাঝে গ্রহণযোগ্য মাওয়ানেয়ে তাকফীরের কোন একটা বিদ্যমান রয়েছে এবং আমরা সেটা তাদের মাঝে বিদ্যমান রয়েছে বলে নিশ্চিত হতে পারি- তাহলে আমরা তাদেরকে তাকফীর করবো না। তবে যদি মানেয়ে তাকফীর দূর হয়ে যায় আর এরপরও তারা বাহিনীতে থাকে তাহলে সুনিশ্চিতভাবে কাফের হয়ে যাবে। আর যদি বাহিনী থেকে বের হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে নাজাত দিয়ে দিলেন। আমাদের কাছে এটাই পছন্দনীয়। আর যদি তাদের মাঝে কোন মানেয়ে তাকফীর রয়েছে বলে আমরা জানতে না পারি তাহলে তাদের ক্ষেত্রে মূল এটাই যে,

তারা ইচ্ছাকৃতভাবে কুফরী কাজে তাগুতদের সহযোগী। কাজেই তাগুত বাহিনীর হুকুম তাদের উপর বর্তাবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

(الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ  
فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا)

(যারা ঈমান এনেছে তারা লড়াই করে আল্লাহর রাস্তায়। আর যারা কুফরী করেছে তারা লড়াই করে তাগুতের পথে। কাজেই তোমরা লড়াই কর শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে। নিশ্চয়ই শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল।)

এ বিষয়ে যদি আরো দলীল প্রমাণ সহ বিস্তারিত দেখতে চান তবে আমি আপনাকে শায়খ সুলায়মান ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব রহ. লিখিত ‘আদ-দালায়িল ফী হুকমি মুআলাতি আহলিল ইশরাক’ কিতাবখানা চিন্তা-ফিকিরের সাথে পড়ার উপদেশ দেব। আপনার অনুরূপ প্রশ্নের জওয়াবেই তিনি কিতাবখানা লিখেছিলেন। লিখক তাতে মাজার এবং মানব রচিত কানুনের সংরক্ষকদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে এবং তাদের বাহিনীতে যোগ দেয় তাদের কানুনের হওয়ার ব্যাপারে দলীল প্রমাণ জমা করেছেন। ওয়া বিল্লাহি তাআলাৎ তাওফীক!

উত্তর প্রদানে: শায়খ আবুল ওয়ালীদ আল-মাকদিসি

শরয়ী বিভাগ, মিস্বারুত তাওহীদ।

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৬৮৫৭>

## শাসক বিষয়ক ফতোয়া জানতে চাই?????

### ইসহাক সাহা

Junior Member

১১-২৫-২০১৭

প্রশ্ন ১ঃ শাসকের বিরুদ্ধে জিহাদ করা কখন বৈধ???

প্রশ্ন ২ঃ কুফুরী করলেই কি শাসকের বিরুদ্ধে জিহাদ বৈধ বা কতটুকু কুফুরী করলে তার উপর জিহাদ বৈধ??

প্রশ্ন ৩ঃ শাসককে যেভাবে তাকফীর করা হয়, জনগনের বিষয়ে সেটা শিথিল কেন??? শাসকেরও তো অজ্ঞতা বা তাওয়ীল বা অপারগতা থাকতে পারে, যেমনটা জনগনের আছে। শাসক ও জনগনকে কেন আলাদা করা হয়।

প্রশ্ন ৪ঃ আর শাসক মুরতাদ হইলেই কি তাকে হত্যা করা যাবে??? এখানে হদ কায়েম কে করবে?????

প্রশ্ন ৫ঃ হদ ও জিহাদের মধ্যে পার্থক্য কি????

কুর'আন-হাদীস, তাবে, তাবে-তাবিয়িন, চার ইমাম, সালাফ-আস-সালেহীন, ইসলামী ইতিহাস ও যুগের শ্রেষ্ঠ মুজাহিদ আলেমগনের এই বিষয়ের উপর মতামত চাচ্ছি।

কেউ যদি এই বিষয়ে বিস্তারিত সিরিজ আকারে লিখতেন অথবা বিজ্ঞ কোন আলেমকে যদি এই বিষয় লিখতে অনুরোধ করতেন, তাহলে উপকৃত হতাম।

আর আগের থেকে যদি এগুলো লিখা থাকে, তাহলে লিখাগুলো কमेंটে দিতে পারেন।

জাযাকাল্লাহু খায়ের

উত্তর

## ইলম ও জিহাদ

Senior Member

১১-২৯-২০১৭

• যে কোন কারণে শাসক মুরতাদ হয়ে গেলে এবং জিহাদ ব্যতীত তাকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করা না গেলে তখন তার বিরুদ্ধে জিহাদ শুধু বৈধই নয়, বরং ফরয। প্রতিটি সক্ষম মুসলমানের উপর ফরয তার বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হওয়া।

• শাসক মুরতাদ হয়ে গেলে যদি তওবা করে মুসলমান না হয়, তাহলে তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে। এই দায়িত্ব সমগ্র উম্মাহর। যে কোন সাধারণ মুসলমানও এই দায়িত্ব পালন করতে পারবে।

মুরতাদ হত্যা আর অন্যান্য হদ কায়েম করা— যেমন: বিবাহিত মিনাকারীকে হত্যা করা, নিরপরাধ ব্যক্তির হত্যাকারীকে কেসাসসরূপ হত্যা করা ইত্যাদি— এ দুটির মাঝে পার্থক্য আছে। মুরতাদকে যে কেউ হত্যা করতে পারে, কিন্তু অন্যান্য হদ কেবল তারাই কায়েম করতে পারে, যাদের এই পরিমাণ শক্তি-সামর্থ্য আছে যে, এর পরবর্তী ফেতনা ফাসাদকে তারা প্রতিহত করে সুশৃংখলা বজায় রাখতে সক্ষম।

• শাসকশ্রেণী এবং সাধারণ মুসলমান জনসাধারণের মাঝে বেশ পার্থক্য আছে। এটা একটু বুঝিয়ে বিস্তারিত আলোচনা দরকার।

এখানে মূল বিষয়টা হচ্ছে— রাষ্ট্রীয়ভাবে শরীয়ত বিরোধি আইন প্রণয়ন বা প্রবর্তন কুফরে আকবার। আর শাসকরা স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে তাতে লিপ্ত হচ্ছে। এখানে তাদের কোন অজ্ঞতা নেই। তারা সুস্পষ্ট জানে যে, সংসদে গিয়ে তারা কুফরী আইন প্রবর্তন করবে, সে অনুযায়ী দেশ চালাবে। বরং এ উদ্দেশ্যেই তারা নির্বাচনে দাঁড়ায়। কাজেই এ ক্ষেত্রে তাদের কোন অজ্ঞতা বা তাবীল নেই।

বেশির চেয়ে বেশি তাদের কারো কারো ক্ষেত্রে এটা বলা যেতে পারে যে, ‘তারা যে কাজটা করছে তা যে কুফর, তারা তা জানে না।’ কিন্তু কাফের হওয়ার জন্য কোন কুফরীতে স্বেচ্ছায় লিপ্ত হওয়াই যথেষ্ট, সেটা করলে কাফের হয় কি’না তা জানা থাকা আবশ্যিক নয়। যেমন— কেউ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কটুক্তি করলো, কিন্তু সে জানে না যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কটুক্তি করলে কাফের হয়ে যায়; এমন ব্যক্তি সর্বসম্মতিতে মুরতাদ। তার

অঙ্গতা ধর্তব্য নয়। কেননা, সে যা করেছে তা স্বেচ্ছায় করেছে। শাসকদের বিষয়টাও এমনই।

পক্ষান্তরে জনগণ তো আর কুফরী আইন প্রবর্তন করেনি যে, তাদেরকে কাফের বলা হবে। তবে হ্যাঁ, সংসদীয় নির্বাচনে ভোট দেয়া একটা কুফর। কিন্তু কিন্তু ভোটের ব্যাপারে জনগণ বড়ই অন্ধকারে। তাদের অধিকাংশ জানেই না সংসদে কি হয়। তারা বরং ঐ দলকে ভোট দেয়, যে দলের দ্বারা বাহ্যিক সুখ-শান্তি বেশি মিলে, জুলুম অত্যাচার কম হয়। কাজেই এ কাজের কারণে তাদের কাফের বলার কোন সুযোগ নেই।

পক্ষান্তরে যদি কেউ এ উদ্দেশ্যে ভোট দেয় যে, এমপিরা সংসদে গিয়ে যেন আল্লাহর শাসন প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের মন মতো আইন তৈরি করে রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ পায়- তাহলে এমন জনগণকেও আমরা কাফের বলবো। এই কাজ যে কুফর, তা তার জানা না থাকা না থাকা তখন ধর্তব্য হবে না।

বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনার দরকার। আপাতত আকীদা-মানহাজের এই অংশগুলো দেখতে পারেন-

১.

### গণতন্ত্র (democracy)

.....

- শরয়ী শাসনের বিপরীতে যারা এই শাসন-ব্যবস্থা প্রণয়ন বা প্রবর্তন করে, তারা কাফের।
- শরীয়তের পরিবর্তে এই শাসন-ব্যবস্থা দ্বারা যেসব শাসক রাষ্ট্র পরিচালনা করে, তারাও কাফের।
- মন্ত্রী এম.পি এবং আইন প্রণয়ন সংস্থার সদস্য- যারা এই কুফরী আইন প্রণয়ন বা প্রবর্তনে লিপ্ত, তারাও কাফের।
- যেসব বাহিনী শক্তিবলে এই কুফরী শাসন-ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করে চলেছে, এর হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণ করছে, এর প্রহরায় নিয়োজিত আছে, তারাও কুফরে আকবারে লিপ্ত।

• এই শাসন-ব্যবস্থার স্বরূপ সুস্পষ্ট হওয়ার পরও যারা এর প্রতি সন্দেহ, এর সমর্থক, প্রচারক এবং যারা জনশক্তি বা আর্থিক যোগান দিয়ে কিংবা অন্য কোন উপায়ে এর সাহায্য-সহযোগিতা করবে, শক্তি যোগাবে, এসব দলকে ভোট দেবে- তারাও কুফরে আকবাবে লিপ্ত।

উল্লেখ্য, এসব কারণে সুনির্দিষ্টভাবে কোন ব্যক্তির উপর কুফর ও ইরতিদাদের হুকুম আরোপ করার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই অজ্ঞতা (الجهل), তাবীল (التأويل) ইত্যাদির মত موانع التكفير তথা তাকফীরের প্রতিবন্ধক বিষয়গুলো লক্ষ্যণীয়। হক্কানী বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামই কেবল এ ব্যাপারে ফায়সালা দেয়ার অধিকার রাখেন। জনসাধারণের জন্য আবশ্যিক উলামায়ে কেরামের আনুগত্য করা।

২.

## তাকফীর

.....

• আমরা বিশ্বাস করি (تكفير معين) তথা নির্দিষ্টভাবে কারো উপর কুফরের হুকুম প্রদানের পূর্বে কিছু নির্দিষ্ট শর্ত রয়েছে, যেগুলো উক্ত ব্যক্তির মাঝে পরিপূর্ণ পাওয়া যেতে হবে। এবং কিছু (موانع) তথা প্রতিবন্ধক রয়েছে, যেগুলো না পাওয়া যেতে হবে। হক্কানী বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামই নির্দিষ্টভাবে কোন ব্যক্তির উপর কুফরের হুকুম প্রদানের যোগ্যতা রাখেন। সাধারণ মানুষের জন্য তাদের অনুসরণ করা জরুরি।

যেমন- শরীয়ত বিরোধি আইন প্রণয়ন কিংবা সে অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা কুফরে আকবার, যা উক্ত ব্যক্তিকে দ্বীনে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। এসব ব্যক্তিকে ভোট দেয়াও মূলত তাদের কুফরী কর্মে অংশগ্রহণ করা। কিন্তু এ কারণে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সকলকে আমরা ঢালাওভাবে কাফের ঘোষণা করি না- যেমনটা নব্য খাওয়াবেজদের অনেকে করে থাকে। কেননা তাদের মাঝে সকলেই এ উদ্দেশ্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে না যে, নির্বাচিত মন্ত্রী এম.পিরা সংসদে গিয়ে আল্লাহ তাআলার শরীয়ত বিরোধি আইন-কানুন প্রণয়ন বা প্রবর্তন করে সে অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করবে; বরং বেশীরভাগ মানুষই তাদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন দুনিয়াবী সেবা, উন্নয়ন ও অগ্রগতির দিকে লক্ষ্য করে ভোট দিয়ে থাকে। অধিকন্তু, তাদের অধিকাংশই গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণের হুকুম সম্পর্কে

অজ্ঞ। এজন্য সংসদীয় নির্বাচনে ভোট দেয়া কুফরী কাজ হওয়া সত্ত্বেও আমরা সাধারণভাবে ভোটদাতা সকলকে তাকফীর করি না।

একইভাবে, যেসব জামাত ইসলামের নামে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে, তাদেরকেও আমরা তাদের ‘তাবিলের’ কারণে তাকফীর করি না- যদিও তাদের এই কাজকে আমরা হারাম ও কুফরী মনে করি।

৩.

### শাসক

• মুসলমানদের শরীয়তসম্মত ইমাম ও শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা আমরা জায়েয মনে করি না; যতক্ষণ না তাদের থেকে ‘কুফরে বাওয়াহ’ তথা সুস্পষ্ট কুফর প্রকাশিত হয়, যে কুফর সম্পর্কে আমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে অকাটা প্রমাণ রয়েছে। যতক্ষণ তারা সৎ কাজের আদেশ দেন, ততক্ষণ তাদের অনুগত থাকা ফরজ মনে করি; কিন্তু অসৎ কাজে তাদের আনুগত্য জায়েয মনে করি না।

• একই সাথে আমরা বিশ্বাস করি, কোন মুসলিম শাসক মুর্তাদ হয়ে গেলে সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপসারিত হয়ে যায়। এরপরও যদি জবরদস্তি ক্ষমতায় বসে থাকে, তাহলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাকে অপসারণ করে শরীয়ত প্রতিষ্ঠাকারী ন্যায়পরায়ণ মুসলিম শাসক নিয়োগ দেয়া ফরয। এ ব্যাপারে আইন্মায়ে কেরামের ইজমা রয়েছে।

• আমরা বিশ্বাস করি, বাংলাদেশ ও এ রকম অন্যান্য দেশের যে সকল শাসক শরীয়াহ পরিপন্থী আইন দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে, তারা কাফের ও মুর্তাদ। কারণ, তারা-

♣ আল্লাহ তাআলার ‘তাওহীদুর-রুবুবিয়াহ’ প্রত্যাখ্যান করে নিজেদেরকে রবের আসনে সমাসীন করেছে। বিধান দানের যে অধিকার আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ব্যতীত আর কারও নেই, তারা তা নিজেদের জন্য দাবি করেছে।

♣ শরীয়তের পরিবর্তে মানব রচিত কুফরী আইন প্রণয়ন ও প্রবর্তন করেছে এবং জনসাধারণের উপর তা চাপিয়ে দিয়েছে।

♣ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বাদ দিয়ে বিশ্বের তাগুত ও আইন্মায়ে কুফরদের কাছে বিচার প্রার্থনা করে।

♣ ঈমান ও কুফরের চলমান যুদ্ধে কুফরের পক্ষ অবলম্বন করে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সহায়তা করে।

• যারা কুফরভিত্তিক সরকার ব্যবস্থার অধীনে কাজ করে, ঢালাওভাবে আমরা তাদেরকে তাকফীর করি না- যা কিনা চরমপন্থী ‘মুকাফফিরাহ’ শ্রেণী করে থাকে। আমরা শুধুমাত্র তাদেরকেই তাকফীর করি, যাদের কর্মকাণ্ড কুফরে আকবাবের মধ্যে পড়ে। যারা কুফরী শাসন ও কুফরী বিধি-বিধান প্রণয়ন, প্রবর্তন বা বাস্তবায়নে লিপ্ত কিংবা যাদের মধ্যে অন্য কোন সুস্পষ্ট কুফর পাওয়া যায়; আমরা কেবল তাদেরকেই তাকফীর করি। পক্ষান্তরে যাদের কর্মকাণ্ড এই শ্রেণীভুক্ত নয়, অন্য কোন কুফর না পাওয়া গেলে আমরা তাদের তাকফীর করি না। যেমন- মুরতাদ সরকারের বিদ্যুৎ, পানি বা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ইত্যাদির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আমরা তাকফীর করি না।

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৮২৪৩>

# কুফরী আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন সূরত এবং তার বিধান

## ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৯-২২-২০১৭

শরীয়ত বিরোধি আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা কুফর। মৌলিকভাবে এর দু' সূরত হতে পারে-

এক. ইসলামী শরীয়াহ'র উপর প্রতিষ্ঠিত এবং শরীয়াহ্ অনুযায়ী পরিচালিত কোন ইসলামী রাষ্ট্রে কোন এক বা একাধিক আইন ইসলামী আইনের বিপরীত প্রবর্তন করা।

এর তিন সূরত হতে পারে-

ক. শরীয়তের হারামকে বৈধতা দিয়ে দেয়া। যেমন, সুদ বা মদের বৈধতা দেয়া।

খ. শরীয়তের হালালকে অবৈধ করা। যেমন, কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে নিষিদ্ধ করা।

গ. শরীয় আইনের স্থলে ভিন্ন আইন জারি করা। যেমন, চুরির শাস্তি হাত কাটার পরিবর্তে জেল-জরিমানা নির্ধারণ করা। এখানে চুরিকে বৈধ করা হয়নি তবে তার শাস্তিতে পরিবর্তন করা হয়েছে।

দুই. শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি ইসলামী শরীয়াহ'র উপর না হয়ে অন্য কোন মতবাদের উপর হওয়া। যেমন- গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি। যেমন- বর্তমান বিশ্বে আমাদের গণতান্ত্রিক মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের শাসন ব্যবস্থা।

এই সকল সূরতে শরীয়ত বিরোধি উক্ত আইন বা মতবাদ তারা নিজেরাই রচনা করতে পারে কিংবা অন্যের থেকে (যেমন- ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়া বা ফ্রান্স থেকে) আমদানীও করতে পারে। তদ্রূপ উক্ত কুফরী শাসন বা কুফরী আইনকে পূর্ব থেকে চলে আসা ইসলামী শাসন বা ইসলামী আইন অপসারণ করেও জারি করতে পারে কিংবা পূর্ব থেকেই চলে আসা কুফরী আইন বা কুফরী শাসনকে

বহালও রাখতে পারে। এই সকল সূরতই কুফর এবং তাতে লিপ্ত শাসকরা ইসলাম থেকে বহিস্কৃত কাফের ও মুরতাদ।

**দলীল:**

ক. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানার মুশরিকরা হারাম মাসকে হালাল করত এবং হালাল মাসকে হারাম করতো। তবে তারা তা নিজেরা চালু করেনি। তাদের পূর্বপুরুষরা চালু করে গিয়েছিল আর তারা শুধু তা ধরে রেখেছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদেরকেও কাফের সাব্যস্ত করেছেন এই আয়াতে-

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحْلُونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِّئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحْلُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زَيْنَ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

[নিশ্চয় কোন মাসকে পিছিয়ে দেয়া (কাফেরদের পূর্ববৎ কুফরের উপর আরোও নতুন) কুফর বৃদ্ধি করে। এর দ্বারা কাফেররা (তাদের পূর্ববৎ পথভ্রষ্টতার উপর আরোও) পথভ্রষ্ট হয়। তারা এ (পিছিয়ে দেয়া মাস) টি এক বছর হালাল করে এবং আরেক বছর হারাম করে, যাতে তারা আল্লাহ যা হারাম করেছেন তার সংখ্যা (অর্থাৎ চার) ঠিক রাখতে পারে। ফলশ্রুতিতে আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা তারা হালাল করে। তাদের মন্দ আমলসমূহ তাদের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে। আল্লাহ কাফের কওমকে হিদায়াত দেন না।] [তাওবা: ৩৭]

কাজেই বুঝা গেল, শরয়ী আইনের পরিবর্তে কুফরী আইন প্রবর্তনই কুফর, যদিও আইন একটাই হয় এবং চাই উক্ত আইন তারা নিজেরাই চালু করুক কি পূর্ব থেকে চলে আসা আইনকে বহাল রাখুক।

খ. ইয়াহুদীদের পূর্ব পুরুষরা যিনার শাস্তি পরিবর্তন করেছিল। পরের যামানার ইয়াহুদীরা তা অনুসরণ করে চলেছে মাত্র। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এদেরকেও কাফের সাব্যস্ত করেছেন।

﴿وَمَنْ لَّمْ يَخُكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾

‘যারা আল্লাহ তাআলা যে বিধান নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করে না তারাই প্রকৃত কাফের।’ (মায়েদা: ৪৪)

এ আয়াতটি তো মূলত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানার ইয়াহুদীদের কেন্দ্র করেই নাযিল হয়েছে। শরয়ী বিধান অপসারণ করে কুফরী বিধান চালু করার কাজটা পূর্বসূরি ইয়াহুদীরা করেছিল। কিন্তু কাফের শুধু তারাই সাব্যস্ত হয়নি, উত্তরসূরি যারা একে বহাল রেখেছে তারাও কাফের সাব্যস্ত হয়েছে।

*উল্লেখ্য যে, ইয়াহুদীরা পূর্ণ শরীয়ত পরিবর্তন করেনি, কিছু আইন পরিবর্তন করেছিল। এতেই তারা কাফের সাব্যস্ত হয়েছে। কাজেই পূর্ণ শরীয়তকেই শাসন ব্যবস্থা থেকে অপসারণ করে দিয়ে শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি কোন কুফরী মতবাদের উপর স্থাপন করা তো এর আগেই কুফর এবং অতি জঘন্য কুফর হবে।*

গ. কুফরী সংবিধান ইয়াসিক প্রণয়ন করেছিল মূলত চেন্সিস খান। পরবর্তী তাতাররা তা অনুসরণ করে চলেছিল। কিন্তু ইবনে কাসীর রহ. এই পরের যামানার তাতারদেরকেই কাফের ফতোয়া দিয়েছেন।

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৭৮০৪>